মূল্যবোধ ও সমাজ পরিবর্তন

প্রফুল্ল চক্রবর্তী*

ভূমিকা

ইদানীং প্রায়ই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, আমরা নাকি আমাদের মূল্যবোধগুলো হারিয়ে ফেলছি। রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষও যেন অপসৃয়মান "বস্তুটির" এ হেন পরিণতিতে বিষাদগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। কেউ কেউ আবার বিশ্বজুড়ে যে শোষণ, বঞ্চনা আর নিপীড়ণ সমাজদেহের রক্ত বিষণ করে চলেছে, তারও কারণ হিসেবে মূল্যবোধের অবমননকে দায়ি করছেন। তৃতীয় বিশ্বের বিকাশশীল দেশগুলোর মধ্যে যে প্রবল জনস্ফীতি, সীমাহীন দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি তথা জীবনের গুণগত মানের অপকর্ষতা মানুষ-জনকে অস্থির করে তুলছে, সে সবই নাকি তাদেরই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে। দেশনায়কেরা আজ বাকসর্বস্য, দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে মগ্ন থেকে জনসাধারণের কল্যাণ তথা দেশ-হিতৈষিকতা ভুলতে বসেছেন, ছাত্র সমাজের আজ অধিকাংশই বেশীর ভাগ শিক্ষকের কাছে স্বদেশ প্রেমের নিশানা পায় না। যুব সমাজ আজ লক্ষ্যহীন, বিভ্রান্ত আর হতাশার শিকার। কেউ কেউ আবার তাদের প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আন্দোলনের নামে হিংসার আশ্রয় নিচ্ছেন। পরিবার যেন সামাজিক কাঠামোর

* ইনডিয়ান ষ্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট, কলকাতা

একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে থাকতে চাইছে না–এ সবই নাকি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে। আবহমানকাল ধরে মানবগোষ্ঠী যে সমস্ত বৃত্তিগুলিকে সযত্নে সরক্ষণ, পোষণ ও সঞ্চরণ করে এসেছে, আজ সেগুলোকে আর তেমন আঁকড়ে ধরতে চাইছে না। নিত্য নূতন ভাবধারায় উদ্বুদ্ব হয়ে সেই পথেই পরিচালিত করছে সমাজকে–ঠেলে দিচ্ছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে। অস্থিরতা বাড়ছে–বাড়ছে বৈষম্য। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কে ধরছে ফাটল। বিশ্বজুড়ে আজ তাই নাকি মূল্যবোধের সংকট।

যে জিনিসটিকে ঘিরে সাধারণ মানুষ, তথা বিদগ্ধ সুধীমহলে এত আলোড়ন, এত আতংক–তার কোনও নির্দিষ্ট রূপ-রেখা আছে কিনা, থাকলে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি কি, প্রকৃতই তার অবলুপ্তি ঘটছে কিনা, আর ঘটলে কিভাবে সেটা ঘটছে, কেনই বা ঘটছে, আর সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতে মানব সমাজ মূল্যহীন হয়ে পড়বে কিনা বা সেটা আদৌ সম্ভব কিনা–সে সবের পর্যালোচনা করার প্রাসঙ্গিকতা (relevance), যথার্থতা (validity), কার্যকাীতা (efficiency) ইত্যাদির সময় বোধ হয় এসে গেছে। কারণ, বেশী বেশী মানুষ আজ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। বিচার-বিশ্লেষণে মূল্যবোধ ব্যাপারটি যদি শুধুমাত্র আবেগময় শব্দেরই ব্যঞ্জনা হিসেবে প্রতিপন্ন হয় তবে তার পূর্ণগঠন প্রয়োজন। আর যদি এই পরীক্ষা নিরীক্ষায় এর পর কাঠামোগত ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে তাহলে তারও সংশোধন দরকার। কেননা, এর মধ্যেই বস্তুটির স্বরূপ কি (what is it?) এটি কি ভাবে রয়েছে (how is it?) কেনই বা তথাকথিত অবক্ষয়ের পথে চলেছে (why is it?) এবং ভবিষ্যতে কোন রূপ পরিগ্রহ করবে (what will it be?) –এর সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

সুতরাং প্রথমেই আমাদের জানা দরকার মূল্যবোধ বলতে আমরা কি বোঝাই? অর্থাৎ মূল্যবোধের সংজ্ঞা কি?

মূল্যবোধের সংজ্ঞা

কোনও শব্দ বা পদের সংজ্ঞা দিতে গেলে প্রথমেই তার বুৎপত্তিগত অর্থের সাহায্য নেওয়া দরকার। কেননা এর মধ্যেই নিহিত থাকে তার গাঠনিক ও কার্যকারি ভূমিকার

উপাদানগুলি। আভিধানিক অর্থে 'মূল্য' পদটি দাম, পণ, গুরুত্ব বা নৈতিক উৎকর্ষতা সূচিত করে। "বোধের" সাথে যুক্ত হয়ে একটি যোগপদে পরিণত হয় এবং তখনই মূল্যবোধ একটি অস্তিত্বশীল গতিময় অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। আর তখন থেকেই শুরু হয় এর জটিলতা – বিশেষ করে, ব্যবহারিক দিক দিয়ে। মূল্যবোধ কথাটির ব্যাখ্যা তাই নানান জনের কাছে নানা রকম।

বেশীর ভাগ মানুষের কাছে মূল্যবোধ হচ্ছে একটি বিশেষ অনুভূতি–তুল্যমূল্য বিচারের ক্ষমতা – যা কিনা কোনও বিশেষ ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, বা জাতির প্রচলিত স্বাভাবিক কাজ কর্মে, ধ্যান-ধারণায় প্রতিফলিত হয়। এবং যেগুলি সততই স্থান কাল ও পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল। এই অনুভূতি এক বা একাধক ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা মানুষ বা গোষ্ঠীকে কোন বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে একটিকে গ্রহণ ও অপরগুলিকে বর্জন করার প্রেরণা জোগায়। ব্যক্তি বিশেষের জীবন-যাপনে, লোক-যাত্রায়, সমাজ-জীবনে যা কিছু বাঞ্ছনীয় – যা কিছু আদর্শস্থানীয় বলে বিবেচিত হয়, তাই জীবন-দর্শনের তথা মূল্যবোধের প্রধান উপজীব্য।

'দাম'-এর কথাটিই ধরা যাক। আমরা 'দাম' যাচাই করি। যে যাচাইটা করি, তার দুটো দিক আছে। একটি দিক হচ্ছে, যা আমরা অর্জন করতে চাই। আর একটি দিক আছে যা আমরা বর্জন করতে চাই। তা হলে একটি দিক হোল যোগ (+), একটি দিক বিয়োগ (–)। অবশ্য এই দুই দিকের মধ্যে আরও একটি ব্যাপার আছে যেগুলো সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ শূন্য (০)। তা হলে মাপকাঠি তৈরি হোল +, ০, – দিয়ে। এই মাপকাঠি দিয়ে প্রতিটি মানুষ সে স্ত্রী হোক পুরুষ হোক, শিক্ষিত হোক অশিক্ষিত হোক, নিম্ন শ্রেণীর হোক–মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হোক বা কি উচ্চ শ্রেণীর হোক–অত্যন্ত দরিদ্র হোক বা অত্যন্ত ধনী হোক–প্রত্যেকে কিছু কিছু জিনিষ অর্জন করার কথা ভাবে এবং কিছু কিছু জিনিস বর্জন করার কথা ভাবে। এবং সেই সঙ্গে আরও কিছু জিনিষ থাকে সে সম্বন্ধে মনোগত কিছু বাসনা না রাখা।

এবার বলি, এরা যদি প্রত্যেক মানুষের আলাদা হোত তা হলো কিন্তু আমরা কোনদিনই মূল্যবোধে পৌঁছতে পারতাম না। বোধটা আসে এই জন্যেই যে কিছু কিছু লোকের যে ধারণা–কি অর্জন করবে বা কি বর্জন করবে তার মধ্যে সমতা আছে। সমতার ফলে কিছু কিছু লোক নিয়ে এক একটি গোষ্ঠী তৈরী হয়। যা কিছু অর্জন

করতে চায়, বর্জন করতে চায়। এই যে গোষ্ঠীগুলো তৈরী হোল এ গুলো হোল সমাজের গোষ্ঠী। এর ফলে সমাজের একটা মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। এই সমাজের মূল্যবোধটা বৃহত্তর গোষ্ঠী দ্বারা স্থিরীকৃত হয় বটে - তবে যারা নিম্নতম গোষ্ঠী – তাদের কথাও বাদ যায় না।

প্রতিটি মানুষই তো চায় তার বর্তমান বা ভবিষ্যত জীবন ধারণের পক্ষে কোন্ কোন্ বস্তুগুলো উপযুক্ত বা কোনগুলি নয় সে গুলো ঠিক করতে। কোনটি শ্রেয় বা কোনটি শ্রেয় নয় সেই গুণ বিচারের ক্ষমতা প্রায় সব মানুষেরই আছে। যার সেই ক্ষমতা নেই সে সমাজে থেকেও যেন নেই। সে জড় বলেই উপেক্ষিত হয়। সেই-সেই মানুষ যার শুভ অশুভ বিচারের ক্ষমতা আছে, তারা প্রত্যক্ষ করে সমাজের অপর অপর মানুষেরা কি ভাবে যাচাই করে নিচ্ছে যে বর্তমান অবস্থায় থেকেও আরও উন্নত জীবন যাত্রার জন্য তারা কি কি জিনিষ অর্জন করবে বা কোনগুলো বর্জন করবে। সেগুলো তারা দেখে, শেখে ও নিজেরাও মেনে চলে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মূল্যবোধের মধ্যে রয়েছে একটা দিক (direction) এবং একটা গতিপথের নিশানা। আমরা সমাজ পরিবর্তনের পটভূমিকায় মূল্যবোধকে বুঝতে চাইছি। তাই একথা। সমাজের কথা বলা হল। কিন্তু সমাজ কি?

সমাজ সম্পর্কে ধারণা

সৃষ্টির সেই আদিকাল থেকে প্রাণীকূল জৈবিক ও অনুষঙ্গিক নানা প্রয়োজন মেটাবার জন্য গোষ্ঠী গঠন করেছে সমভাবাপন্ন মন নিয়ে। মানুষের বেলায় আরও একটা কারণ হচ্ছে, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় যে বড়ই অসহায়! তার সত্ত্বার মধ্যেই আছে সঙ্গ প্রিয়তা। সঙ্গ প্রিয় মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই একে অন্যের সাথে সম্পর্ক জাল স্থাপন করেছে। নিবিড় এই সম্পর্ক-জালে আবদ্ধ মানুষ যখন গোষ্ঠীভূক্ত হয়ে নির্দিষ্ট কোনও ভৌগলিক সীমানায় বসবাস করে তখনই সৃষ্টি হয় তাদের সমাজ। সমাজকে টিকে রাখবার জন্য চাই সমাজতন্ত্র, যার আবার দুটো অংশ। এক, সমাজ কাঠামো। দুই, সমাজ কার্যবলী। বিভিন্ন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য সামাজিক কাঠামো ও কার্যবলীর মধ্যে থাকে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া কলাপ। এই ক্রিয়া কলাপই সামাজিক কাঠামোর প্রধান স্তম্ভগুলোয়– যেমন, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংঘ ও মূল্যবোধের মধ্যে অবিরাম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যোগায়। এর ফলে তারা

প্রতিনিয়ত সচল থাকে। পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলে। এবং স্বভাবতই সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। সেটা হচ্ছে, পরিবর্তন কাকে বলে? সামাজিক পরিবতর্নটাই কী?

পরিবর্তন কি?

সমাজের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উপনীত হবার প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন বলে। অর্থাৎ অবস্থান্তরকে পরিবর্তন বলা হয়। সামাজিক উন্নয়নের সূচক (social indicator) স্থির করার জন্য পরিবর্তন প্রক্রিয়া উপলব্ধি করা দরকার। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মুখার্জী (1975) এ প্রচেষ্টায় ব্রতী থেকে পরিবর্তনকে আরও প্রাঞ্জল করে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, পরিবর্তন শুধুমান চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ বা গণনার ওপর নির্ভর করে না। এই ব্যাপারটি সম্যক উপলব্ধি করতে গেলে চাই বিশেষ কৌশল। সেটি নির্ভর করে কোন্ পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তার ওপর। যদি অবরোহী পদ্ধতি (inductive) ও অনুমিতি পদ্ধতি (inferential নেওয়া যায় তা হলে পরিবর্তন প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। পরিবর্তনের মূল্যায়ন হওয়া উচিৎ এক বা একাধিক গুণসমূহের মধ্যে দুটি সময়ের ব্যবধানে কি বা কতটা পার্থক্য ঘটলো সেটার নির্দিষ্ট স্কেল বা মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করা। কিন্তু সব পার্থক্যই তো সমাজ পরিবর্তন নয়। পরিবর্তন হতে গেলে বস্তু বা বস্তুসমূহের বদল হয়ে যাওয়া (replaced) এবং বদল হয়ে যাবার প্রলক্ষণ (replacealibity) থাকা চাই। চাই একটা নির্দিষ্ট মাপ কাঠি। সে সব আলোচনার স্থান এখানে নেই। মূল কথায় ফিরে আসা যাক্। মূল্যবোধ কি এক না একাধিক? এর প্রকার ভেদ কি?

মূল্যবোধের প্রকার ও ধরণ ঃ

এ সম্পর্কে মনে হয়, এ শতকের গোড়ার দিকে Spranger-ই সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন। Spranger মূল্যবোধের স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এদের ছ'টি ভাগে বিভক্ত করেন। সেগুলো হোল ঃ

1) Theoritical (তাত্ত্বিক)

2) Practical (ব্যবহারিক)

3) Social (সামাজিক)

4) Religious (ধর্মীয়)

5) Aesthetic (নান্দনিক) এবং

6) Political (রাজনৈতিক)

এর ওপর ভিত্তি করেই পাশ্চাত্য জগতে ও এদেশেও বহু সমাজ গবেষক-বিশেষ করে, সমাজ মনস্তত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ মূল্যবোধকে নানা ভাবে দেখেছেন, মূল্যায়ন করেছেন। দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন (১৯৬৮) হিন্দু জীবন বোধ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় সনাতন মূল্যবোধ-এর ভিত্তিতে মূল্যবোধগুলিকে এই চারভাগে এই বিভক্ত করেছেন ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ ও কাম। রাধাকমল মুখার্জীও সমাজবিজ্ঞানের আলোয় Spranger এর পথই অনুসরণ করেছে। V.K.R.V. Rao-এর মতো অর্থনীতিবিদ্ নতুন কিছু বলেন নি। বিদগ্ধ পাণ্ডত দর্শনিক P.N. Haksar ও মোটামুটি নীতির সাথে মূল্যবোধকে মিলিয়ে ফেলেছেন।

আমার মনে হয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রামকৃষ্ণ মুখার্জীও আমার সঙ্গে একমত যে, আমাদের মূলতঃ চারটি প্রাথমিক মুল্যবোধ আছে যে গুলো ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও জীবনবোধ বজায় রাখা দুস্কর। এ গুলোকে শাশ্বত মূল্যবোধ (cardinal, universal values) বলা যায়।

প্রথমটি হোল, এই যে, মানুষকে বেঁচে থাকতে হবে। একে ইংরেজীতে বলে survival। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিরাপত্তা ইংরেজীতে যাকে বলে Securitry। তৃতীয়টা হোল এই যে-এই যে বেঁচে থাকা এবং নিরাপত্তা যে দুটোর কোনটিই সম্ভব হোত না যদি না মানুষের ক্রমাগত উন্নতি না ঘটতো। যেটাকে ইংরেজীতে বলে Material prosperity। আবার যদি বস্তুগত বা আর্থিক উন্নতি ঘটে আর কিছু না ঘটে, তা হলে আমাদের জীবনে অনেক কিছু ঘটতে পারে যেগুলো মানুষের অস্তিত্ব, নিরাপত্তা বা আর্থিক উন্নতিতে সবেতেই আঘাত হানতে পারে। তখনই বলতে হয়, আর একটা জিনিসের দরকার, সেটা হচ্ছে মানসিক প্রগতি। ইংরাজীতে যাকে বলে Material progress।

এই চারটিকে যদি আমরা "আদর্শ" বলে মেনে নিই, তা হলে দেখতে হবে যা-যা ঘটছে সেগুলো অনেক সময়েই কোনও না কোনও লোক বা কোনও না কোন গোষ্ঠী খুব সহজে পাবার চেষ্টা করছে এবং পাচ্ছেও।

উদাহরণ? বিভিন্ন পটভূমিকায় দেখা যাক। কি ধরনের মূল্যবোধ বিশ্ব সমাজে এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কম বেশী দেখা দিয়েছে?

বেঁচে থাকার তাগিদে দরকার অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা অর্থাৎ উৎপাদন-বন্টন ব্যবহার প্রতি লক্ষ্য রাখা বা এক কথায় আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকা। তা যা বলেছিলাম একটু আগে অর্থাৎ খুব সহজেই এখনকার সমাজে কেউ কেউ পেয়ে যাচ্ছে। আজ ১৫/১৬ বছরের ছেলেমেয়েরাও জানে শুধু যোগ্যতা বা কাকুতি মিনতিতে কোনও কাজ হয় না যদি না "ঘুষ" হিসাবে সঙ্গে একটি কারেন্সী নোট গুঁজে না দেওয়া হয়। অবশ্য একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে দিয়েই সকলকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তা হলে তা গোটা সমাজই ভেঙ্গে পড়তো টাকার চাপে। ট্রাজেডী অন্যত্র এবং সে হোল, বহু মানুষই আজ মনে করে, ঘুষ দিয়ে সব কিছু কেনা যায়। একটা শিশুর মনেও সাক্ষর হবার সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। সে রেডিও খুলে টিভি খুললে খবরের কাগজ ওল্টালে দেখতে পাচ্ছে শুধু দুঃসংবাদ-দুর্নীতি, চুরি, ভ্রষ্টাচার, স্বজন-পোষণ, অন্যায় ও অবিচার। কিছু জেনে নেয়; পারিপার্শ্বিক সঙ্গ ও পরিবার থেকেও।

উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে-বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় -"Work culture" এর হবার ফলে, তথা কথিত "Bandh Virus" এর আক্রমণে শিল্প-বাণিজ্য-কৃষির অসুস্থতায়। ছেলেমেয়েরা ছোট থেকেই দেখে আসছে, বাসে, ট্রেনে বিনা টিকেটে ভ্রমণ সমাজে তারুণ্যের প্রতীকী প্রকাশ; তারা দেখে তাদেরই বাবা, কাকা জেঠা, মামারা হঠাৎ ফুলে ফেঁপে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে; যে পথ তারা অনুসরণ করে এসব করতে পারছেন, সেই পথটি এখন মহাজনের চলার পথ; তারা দেখছে যে গোয়ালা দুধে জল মেশায়, যে গোলাদার খাবারে ভেজাল দেয়, যে ব্যবসায়ী অবস্থা বুঝে বাজার থেকে অতি মুনাফায় লোভে মাল সরিয়ে ফেলে, তারা সকলেই আজ অকুতোভয়। কারণ তারা সংঘবদ্ধ। সংঘবদ্ধ হয়ে অপরাধ করলে সেটা অপরাধ থাকে না। সংঘবদ্ধ হয়ে অপরের জমির ফসল কেটে নিলে সেটা হয় আন্দোলন, অন্যের বাড়ি চড়াও হয়ে লুট পাট করলে সেটার নাম দেওয়া হয় আদর্শগত সংঘাত। সংঘবদ্ধ হয়ে হামলা ও অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত হয়ে উৎপাদন বন্ধ করলে তার নাম দেওয়া হয়

শ্রমিক আন্দোলন। সংঘবদ্ধ শক্তি জনসাধারণের চলাচলের হাতে সৃষ্টি করতে পারে অবরোধ, সরকারী জমি দখলে রেখে যে কোনও সর্বজনীন উন্নয়নকে বছরের বছর পর ধরে স্তব্ধ করে দিতে পারে। এ সব ঘটনা অনন্ত।

এখনত বহু লোক গর্ব করে বলে তার কত কালো টাকা আছে। দরকারী হিসেব ধরলে ভারতে বর্তমানে ৪০ হাজার কোটী কালো টাকা দেশের এক শ্রেণীর সঙ্গতি ও প্রতিপত্তিশালী পরিবারে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং কদাচিৎ এ ধরনের কোনও পরিবারে আয়কর হানা দিলে সে পরিবারের সামাজিক প্রতিপত্তি সামগ্রিক বিবেচনায় বেড়ে যেতে পারে।

এবার সামাজিক পটভূমিকায় বর্তমান মূল্যবোধের প্রকৃতির কথা বলা যাক।

যত দুর্নীতিই থাকুক, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আগের তুলনায় কিন্তু এখন অনেক বেড়ে গেছে। দ্বিতীয়ত মানুষ আরোপিত (ascriptive) মর্যাদার চেয়ে এখন বেশী মূল্য দিচ্ছে অর্জিত গুণাবলীর দিকে। তৃতীয়ত: এবং ফলস্বরূপ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রতা বাড়ছে। চুতর্থত: এবং স্বাভাবিক নিয়মেই প্রথাগত দায় দায়িত্ব নেবার বা কর্তব্য কর্ম করবার প্রবণতা কমে যাচ্ছে অথচ সুযোগ সুবিধা নেবার ও অধিকার সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হচ্ছে। পঞ্চমত: দেখা দিচ্ছে স্বার্থপীরতা, ক্ষুদ্র সীমিত নিউক্লীয়ার পরিবার প্রথা। এবং স্বভাবতই রওগত সম্বন্ধের প্রতি অনীহা। প্রকটতর হচ্ছে বেশী বেশী বর্তমান প্রজন্মের মানুষজন কুটম্বঘেঁঘা সম্পর্কের দিকে নারীবাদ দেখা দিয়েছে। মেয়েরা নেবে পরছেন ঘর ছেড়ে বাইরে। প্রগতি হচ্ছে। সমতা ফিরিয়ে আসবার চেষ্টা হচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা বাড়ছে। দলীয় রাজনীতির উপর জনসাধারণের হতাশা পুঞ্জীভূত আক্রোশে ফেটে পড়ছে। আস্থা কমে গেছে। জনসাধারণের মধ্যে "Cynicism" দেখা দিয়েছে।

সব চাইতে বড় মূল্যবোধ দেখা দিয়েছে এই যে, আমাদের মূল্যবোধের মাপকাঠিটাই আমরা যেন হারিয়ে ফেলতে বসেছি। আমাদের মধ্যে ক্রমেই ফুটে উঠছে একটা দ্বৈত মূল্যমান (Double Standard)।

মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে কেন?

মূল্যবোধ বদলাচ্ছে। এটা চিরকালের সময়ের প্রেক্ষীতে বদলাবে। যেমন, কেউ যদি আজকে 'একাল সেকাল' বইটি পড়েন, দেখবেন যে তাদের মধ্যে যে মূল্যবোধ সেটাও বদলে গেছে। আমরা প্রত্যেক সময় শুনে থাকি, পিতৃ-পিতামহের যে

মূল্যবোধ, সে মূল্যবোধ আজ আর নেই। আবার পিতামহের যে মূল্যবোধ, সে মূল্যবোধও আজ নেই। এই যে মূল্যবোধের তফাৎ হচ্ছে, সেটা আমরা প্রথমে যে মাপকাঠির কথা বল্লাম, সেটা দিয়ে মূল্যায়ন করে দেখবো ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে, শুধু ভারতবর্ষে নয়, শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা বিশ্বের পটভূমিকায় দেখতে হবে সেই শাশ্বত মূল্যবোধ চারটি কোনপথে চলেছে।

সমাজ তো স্থানু নয়। সমাজ পরিবর্তনশীল। তাই সমাজের উপাদানগুলির মধ্যেও স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় পরিচালিত। মূল্যবোধের এই যে পরিবর্তন সেটাও ঘটবে। তবে যা কিছু ঘটে তার পেছনে কোনও না কোন কারণ থাকেই। কেননা কারণ ছাড়া কার্য চিন্তা করা যায় না। মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণগুলো বিশেষ করে, ভারতবর্ষের পটভূমিকায় বিশ্লেষণ করতে গেলে একটু গোড়ার কথা বলতেই হয়।

শিল্প-বিপ্লবের পর গ্রামীণ লোক-সমাজের ভিত্তিমূল গড়ে ওঠে। ছিন্নমূল হয়ে গ্রামীণ মানুষ-জন শহর জীবনের স্রোতে মিশে যেতে শুরু করে। চিড় ধরতে থাকে চিরায়ত মূল্যবোধে। শহরের শিল্পকেন্দ্রিক জীবনে প্রতিযোগিতা বেশী, সংগ্রাম কঠোরতর– সুযোগ সে তুলনায় সীমিত। তাই বেপরোয়া হয়ে মূল্যবোধের সঙ্গে সমঝোতা করতে শুরু করে। একটু একটু করে নির্দয় হতে থাকে। সেই সঙ্গে জন্ম নেয় অর্থকেন্দ্রিকতা। দুটি মহাযুদ্ধ ও সমসাময়িক অন্যান্য কারণও ঐ নির্দয় অবস্থাকে পরিণত করে নিষ্ঠুরতায়। যুদ্ধ মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের বিশ্বাসের মূলে ঘা দেয়। যে সুকুমার বৃত্তিগুলি মূল্যবোধের শেকড়–তাদের হৃদয় থেকে উপড়ে ফেলে।

মনে হয়, শিল্পায়ন, নগরায়ণ, পাশ্চাত্য অনুচীকির্ষা, আধুনিকতা এসবই মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণ।

মহাযুদ্ধের পর আশা করা গিয়েছিল মানবতাবোধের নব উন্মেষ ঘট। আশা করা গিয়েছিল নব উন্মেষিত মানবজাতি এমনই এক মূল্যবোধের সৃষ্টি করবে যা দিয়ে তাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর ও আরও উদ্দেশ্যময়। কিন্তু যুদ্ধ পরবর্তী যে উন্নয়নের ধারা আজ বিশ্ব জুড়ে চলেছে দুর্বার গতিতে–যার প্রভাব ভারতবর্ষের মতো দেশেও এসে পড়েছে–সে উন্নয়নের আর এক নাম ভোগবাদ, ইংরাজীতে যাকে বলে "Cousumerism"। এই ভোগকেন্দ্রিক অর্থলোলু পতার প্রতিযোগিতায় নতুন মূল্যবোধ তেমন করে জন্মাতে পারছে না।

কেউ কেউ মনে করছেন, এই মূল্যবোধের পরিবর্তনের মধ্যে অবক্ষয় সূচিত হচ্ছে। এর কারণ ধর্মের সঙ্গে জীবনের বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে বলেই এটি হচ্ছে। ধর্ম আমাদের কতগুলি অনুশাসন শেখায়– চৈতন্য দেয়। সেটা আমরা পাচ্ছি না। শিক্ষা ব্যবস্থাও দায়ী এর জন্য। কুশিক্ষা পাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। কুশিক্ষার চেয়ে বরং অশিক্ষা ভাল। এর প্রমাণ মেলে অশিক্ষিত সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাঁও, ওদের মধ্যে। এদের মধ্যে আছে আতিথেয়তা, আছে সততা, উদারতার মতো নানা গুণ, যেগুলো মানসিক প্রগতির পরিচায়ক অথচ শিক্ষিত মানুষজনের বেশীর ভাগের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে পক্ষপাতিত্ব, অসততা, কতর্ব্যে ফাঁকি দেবার প্রবণতা। শিক্ষার সাথে ধর্মের ভালো ভালো দিকও দিতে হবে এই প্রজন্মের মানুষজনের।

মূল্যবোধের ইতিবাচক দিকে প্রচলিত করার দায়িত্ব কার?

দায়িত্ব নিতে হবে নিজেদেরই। শোধরাতে হবে নিজেদেরই, কেউ দায়িত্ব নেবার নেই। তবে তখন দেখতে হবে এই, যে চারটি শাশ্বত মূল্যবোধের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছি – তার কোনটার জোর কোন জায়গায় বেশী বা কোন জায়গায় কম। আজকে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বেঁচে থাকা এবং নিরাপত্তা–এরই প্রয়োজন বড্ড বেশী হয়ে পড়েছে–বিশেষ করে এই কারণে যে, আগেই বলেছি, ক্ষুদ্র কোনও কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য তারা বড় বড় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙ্গে ফেলছে–গুঁড়িয়ে ফেলছে। অন্যায় করছে। এই যে ধরনের গুণ, এতে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের মতো জায়গায় কাজ করছে না। কারণ সেখানে তার দরকার হচ্ছে না। সেখানে বৃহত্তর গোষ্ঠীর পক্ষে বেঁচে থাকা এবং নিরাপত্তাটা খুব বড় সমস্যা নয়। এটা যে সমস্যা একেবারে নয় তা বলছি না। যেমন, তাদের দেশেও যারা কৃষকায় তাদের কাছে এটা সমস্যা। তাদের যারা চিকালো বলা হয়–তাদের কাছেও সমস্যা। কিন্তু যাদের আমরা মোটামুটি American বলি তাদের কাছে এটা তেমন সমস্যা নয়। তাদের কাছে সমস্যা হচ্ছে এই যে, আর্থিক যে উন্নতি হয়েছে তারফলে সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রগতি কি হয়েছে? এই প্রশ্ন। সেটা হয়তো হয়নি। তার জন্যই প্রশ্নটা আসছে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায়–স্থান কাল পাত্র হিসাবে বিচার করতে হবে মূল্যবোধ ভালোর দিকে যাচ্ছে না খারাপের দিকে যাচ্ছে। তবে যারা বিশ্বে এখন মূল্যবোধের এমন একটি অবস্থা হয়েছে যেখানেতে এই জিনিস নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলি, মুল্যবোধ বিষয়টি নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তার সময় এসে গেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে এটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

বিশ্ব সমাজে প্রতিটি মানুষই উন্নততর মানুষে পরিণত হোক এই তার চিরন্তন কামনা। সমাজ ব্যবস্থা বদলাবার জন্যে যখন সে বিপ্লব করে তার পেছনেও কাজ করে সেই সুপ্ত কামনা। বস্তুতঃ মানুষকে নিয়েই তো সমাজ। সমাজ নিয়েই তো রাষ্ট্র। সেই মানুষই যদি বিবেক বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে শুধুমাত্র তিনটে প্রধান মূল্যবোধ চরিতার্থ করবার উল্লাসে চতুর্থটিকে বর্জন করে চলে তবে তাদের দিয়ে কোনও প্রগতিমুখী সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়। এই জন্যই চাই সামগ্রিক মূল্যবোধের চেতনা। যথাযথ মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ। আশার কথা, চেতনার চিহ্নগুলো ফুটে উঠছে। এটাই মনে হয় একবিংশ শতাব্দীর সূচনায় মূল্যবোধের ইতিবাচক দিকে। এই চেতনার অভিব্যক্তিই ব্যক্তির জীবনে নতুন নতুন মূল্যবোধের উন্মেষ সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার করে নবতর মূল্যবোধের জন্ম দেবে।